ইউনিট ৫: তুলনামূলক শিক্ষার সমস্যা... ও সমাধানসমূহ

ভূমিকা

গত একশত বছরে তুলনামূলক শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক গবেষণার প্রতিবেদন, গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এসব প্রতিবেদনে তুলনামূলক শিক্ষার সমস্যা বা ইস্যুসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব সমস্যা এক দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা অন্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতির চেষ্টা চলেছে। সমস্যার ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে জেন্ডার, শিক্ষক শিক্ষা, একীভূত শিক্ষা, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু শিক্ষা, আদিবাসী শিক্ষা অন্যতম। তুলনামূলক শিক্ষা সমস্যা সমাধানে নিম্নলিখিত পাঠগুলোর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এ পাঠগুলো হচ্ছে–

পাঠ ৫.১: জেন্ডার, নারী শিক্ষা এবং ক্ষমতায়ন
পাঠ ৫.২: শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষকদের পদ মর্যাদা
পাঠ ৫.৩: সমন্বিত শিক্ষা
পাঠ ৫.৪: বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু
পাঠ ৫.৫: কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা
পাঠ ৫.৬: আদিবাসী শিক্ষা
পাঠ ৫.৭: সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা

পাঠ- ৫.১: জেন্ডার, নারী শিক্ষা এবং ক্ষমতায়ন
Gender, Women Education and Empowerment

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নারী শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন উল্লেখ করতে পারবেন।
- নারীর ক্ষমতায়নে প্রতিবন্ধকতাও নারীর ক্ষমতায়নের উপায়সমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

জেন্ডার

জেন্ডার হল নারী পুরুষের ভূমিকা সমতা, সম-অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং কাজের ক্ষেত্রে একে অপরের পারস্পরিক সম্পর্ক। জেন্ডার বলতে সমাজে একজন নারী বা পুরুষের পরিচয় বা কার্যকে নির্দেশ করে। কিন্তু এসব বিষয়গুলো দেশ, কাল, স্থান, সংস্কৃতি ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। আর এসব বিষয়গুলো নির্ধারণ করেছে সমাজ। তাই সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে নারী-পুরুষের জন্য নির্ধারিত, অর্পিত কর্ম ও দায়িত্ব ও আচরণে এবং ভূমিকা পরিবর্তন ঘটে।

জেন্ডার বৈষম্যের ধারণ

জেন্ডার হলো একটি মানসিক ব্যাপার। জগতের বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষ ও নারীর তুলনামূলক পর্যালোচনা যারা পিছিয়ে পড়া তাদেরকে নিয়ে সমতা বিধান করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হলো জেন্ডার সচেতনতা। জেন্ডার বৈষম্যের উদাহরণ হলো–

- নারীদের পোষাক, শাড়ী আর পুরুষদের পোশাক, শার্ট-প্যান্ট;
- সমাজে প্রচলিত ধারণা পুরুষেরা উপার্জন করে আর নারীরা সংসারের যাবতীয় কাজ করে;
- ছেলেদের মত মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা এবং ক্ষমতায়নের কোনো প্রয়োজন নাই;
- সন্তান লালন-পালন ছেলেদের কাজ নয়, এটি সম্পূর্নরূপে নারীর দায়িত্ব;
- খেলাধুলা, যানবাহন চালক, সরকারি/বেসরকারি কর্মক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি মেয়ে সন্তানদের তুলনায় ছেলেদের বেশী সুযোগের প্রয়োজন।

জেন্ডার বৈষম্যের কারণ

- পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা;
- অতিরক্ষণশীলতা;
- নারী শিক্ষার পশ্চাদপদতা;
- বিভিন্ন ধর্মে পুরুষ ও নারীর অধিকারের অসমতা এবং বিভ্রান্তিকর প্রচারনা;
- নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবারের অনীহা;
- নারী উন্নয়নে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের অভাব এবং সমন্বয়হীনতা;
- নারীদের সামাজিক নিরাপত্তার অভাব;
- নারী অধিকার আইনের প্রয়োগের অভাব এবং দীর্ঘ সূত্রিতা;

- নারী কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা, সচ্ছতার অভাব, কর্মসংস্থান সম্পর্কে তথ্যের অভাব;
- অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর সীমিত অংশগ্রহণের সুযোগ এবং নৈতিবাচক মানসিকতা ইত্যাদি।

জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের উপায়

- শিক্ষার মাধ্যমে সচেতনা সৃষ্টি করা;
- পরিবারে নারীদেরকে পুরুষদের সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা;
- যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা;
- ছেলে-মেয়ে উভয়কেই শিক্ষার সমান মানসম্মত সুযোগ করে দেয়া;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়ের মতামত সমান গুরুত্ব দেয়া;
- সরকারিভাবে সর্বপ্রকার কর্মকান্ডে নারী ও পুরুষদের সমমাত্রায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- আন্তর্জাতিকভাবে প্রণীত নারী শিক্ষার আইনের যথাযথ প্রয়োগ করা;
- শিশু, কিশোর ও কিশোরীদের জন্য উন্নতমানের পাঠ্য বই পাঠের ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

নারী শিক্ষা

শিক্ষাকে আমরা বিদ্যা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিজ্ঞান অনেক নামেই অভিহিত করতে পারি। দেশও সমাজ উন্নয়নের মূলভিত্তি- শিক্ষা। সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক নানা কারণে এদেশের দরিদ্র মানুষ যেমন বঞ্চিত হয়েছে তেমনি সর্বস্তরে ব্যাপক সংখ্যক নারী ও এই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। নারী শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে নারীকে সচেতন ও প্রত্যয়ী করা, সম-অধিকারের অনুকূলে নারীর দৃষ্টিভঙ্গী প্রখর করা, সকল পর্যায়ে দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহণে নারীকে উদ্বৃদ্ধ ও দক্ষ করা, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ও দারিদ্র বিমোচনে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধনে সহায়তা করা, সুন্দর ও স্বচ্ছন্দ্যময় পরিবার গঠনে উৎসাহিত করা এবং যৌতুক ও নারী নির্যাতনরোধ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে পারেন এমন দৃষ্টিভঙ্গি ও আত্মপ্রত্যয় নারীর মধ্যে সৃষ্টি করা।

শিক্ষায় সম-অধিকার

নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দূর করা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সব ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে "Convention on the Elimination of all forms of discriminition against women (CEDAW)" সনদ গৃহীত হয়।

এ সনদে শিক্ষাক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে যেসব বিষয় নিশ্চিত করার লক্ষে রাষ্ট্রসমূহ নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এগুলো হচ্ছে:

ক. কর্মজীবন ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা, পল্লী ও শহরাঞ্চলে সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ ও ডিপ্লোমা লাভের সুযোগের জন্য একই শর্তাবলি, স্কুলপূর্ব, সাধারণ, কারিগরি, পেশাগত ও উচ্চতর কারিগরি শিক্ষা, সেই সাথে সকল ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের এই সমতা নিশ্চিত করা সেই সাথে সকল ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের এই সমতা নিশ্চিত করা।

খ. একই শিক্ষাক্রম, একই পরীক্ষা, একই মানের যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক এবং একই মানের বিদ্যালয় চত্বর ও সরঞ্জামি লাভের সুযোগ প্রদান।

গ. সহশিক্ষা এবং পুরুষ ও নারীর ভূমিকা সম্পর্কিত চিরাচরিত ধারণা দূরীকরণের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক অন্য ধরনের শিক্ষা উৎসাহিত করার মাধ্যমে, বিশেষ করে পাঠ্য পুস্তক ও বিদ্যালয় কর্মসূচি সংশোধন এবং উপযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে এবং সকল ধরনের শিক্ষায় পুরুষ ও নারীর ভূমিকা সম্পর্কিত চিরাচরিত যে কোনো ধারণা দূরীকরণ।

ঘ. বৃত্তি ও অন্যান্য শিক্ষা মঞ্জুরি থেকে লাভবান হওয়ার সমান সুযোগ প্রদান।

ঙ. বয়স্ক ও কর্মমূলক শিক্ষা কর্মসূচিসহ শিক্ষা অব্যাহত রাখার কর্মসূচি, বিশেষ করে পুরুষ ও নারীর মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান যে কোনো দূরত্ব সম্ভব স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রণীত কর্মসূচিসমূহে সুযোগ লাভের একই সুবিধা প্রদান।

চ. ছাত্রীদের বিদ্যালয় ত্যাগের হার কমানো এবং যে সব বালিকা ও মহিলা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বিদ্যালয় ত্যাগ করেছেন, তাদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা।

ছ. খেলাধুলা ও শারীরিক শিক্ষায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য একই সুযোগ প্রদান।

জ. পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য ও পরামর্শসমূহ নির্দিষ্ট শিক্ষামূলক তথ্য পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি।

শিক্ষা নারী ও পুরুষের সমান সুযোগ প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রসমূহের কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণে সেডো সনদ প্রধানত গুরুত্ব আরোপ করেছে।

এ আলোকে বাংলাদেশে সাধারণ শিক্ষা, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষায় সকল স্তর ও ধারায় নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়াতে বিশেষ বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। শিক্ষায় বিভিন্ন স্তরে মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়ানো, মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরে বিজ্ঞান শিক্ষায় মেয়েদের ভর্তি বাড়ানো, বৃত্তিসহ বিভিন্ন অতিরিক্ত সুযোগ প্রদান, মেয়েদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়ানো ইত্যাদির ওপর জোর দেয়া হয়।

নারীর ক্ষমতায়ন

ক্ষমতায়ন নারী-পুরুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন মান অর্জনের ব্যাখ্যা। অর্থাৎ ব্যক্তির নিজ জীবন কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে তা ঠিক করা। ক্ষমতায়ন ব্যক্তির ভেতরে আত্মবিশ্বাস দৃঢ় করে, যার দ্বারা সে সমস্যা সমাধান করতে শেখে, পেশা গত দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করে এবং পরমুখাপেক্ষী না হয়ে স্বনির্ভর হয়। এভাবে একজন নারী বা পুরুষ যখন জীবন জিজ্ঞাসার মতামত গ্রহণে ক্ষমতার অধিকারী হয় তখন মনে করা হয় তার ক্ষমতায়ন হয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়নকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- (ক) অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, (খ) সামাজিক ক্ষমতায়ন ও (গ) রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলধারায়নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ। এর ব্যাখ্যায় বলা যায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাস্তবায়ন, অভিগম্যতা, নিয়ন্ত্রণ এবং সমতার ভিত্তিতে সুফল ভোগে নারীর পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সামাজিক ক্ষমতায়ন বলতে নারীর অধিকার ভোগের বিষয়টি প্রথমে আসে। সমাজে নারী কী ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং সে ভূমিকা পালনে তার ক্ষমতার চর্চা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়টি বোঝায়। রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন হলো রাজনীতি চর্চায় নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ। ভোট প্রদান, নির্বাচনে অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক দলে সমতার নিশ্চিতকরণ।

নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ
- পিতৃতন্ত্রের সপক্ষে রচিত আইনকানুন
- ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি

- ধর্মীয় গোঁড়ামি
- আধুনিকায়ন উন্নয়ন কৌশলের অনুসরণ
- নারী প্রতিকূল পরিবেশ ইত্যাদি।

নারীর ক্ষমতায়নের উপায়সমূহ

- নারী শিক্ষার প্রসার ও উদ্বুদ্ধকরণ
- রাজনৈতিক কাঠামোয় নারীর অংশগ্রহণ
- নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টিকারী আইন পরিবর্তন
- সার্বজনীন পারিবারিক আইন বাস্তবায়ন
- প্রচার মাধ্যমে নারীর প্রতিনেতিবাচকদৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন
- নারীর কাজের স্বীকৃতি প্রদান
- সকল প্রকার গৃহস্থলী কাজে পুরুষের অংশগ্রহণ
- স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন ধারা অনুসরণ
- রাজনীতির গণতন্ত্রায়ন
- সচেতনতা সৃষ্টি
- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নারীর অভিগম্যতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নিচের কোনটি নারী ক্ষমতায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে?
ক. পুরুশের মতামতের প্রাধান্য
খ. দারিদ্র্যতা
গ. বহু বিবাহ
ঘ. বাল্য বিবাহ

২. নিচের কোনটির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব?
ক. ধর্ম নিরপক্ষতা
খ. জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি
গ. দেশ প্রেমে উদ্ভুদ্ধ করা
ঘ. নারীর কাজের মূল্যায়ন

উত্তরমালা: ১. ক, ২. ঘ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. জেন্ডার কী?
২. জেন্ডার বৈষম্যের কারণসমূহ লিখুন।
৩. নারীর ক্ষমতায়ন বলতে কী বুঝায়?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষায় সমঅধিকারে সিডার ভূমিকা বর্ণনা করুন।
২. নারীর ক্ষমতায়নের একটি বিদ্যালয়ের ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।
৩. নারী ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধকতাগুলো কী কী?
৪. নারীর ক্ষমতায়নের উপায়গুলো উল্লেখ করুন।

পাঠ ৫.২: শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষকদের পদ মর্যাদা
Teacher Education and Teachers' Status

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিক্ষক প্রশিক্ষণের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ কী এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য উল্লেখ করতে পারবেন।
- শিক্ষকদের পদ মর্যাদা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

সুশিক্ষা ও মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে মানসম্পন্ন শিক্ষক। শিক্ষকের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য একদিকে প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত ও স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করা, অন্যদিকে প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষা। তাই চাহিদা ভিত্তিক যুগোপযোগী শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধন করা।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের পটভূমি

শিক্ষক প্রশিক্ষণের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এটি বেশ প্রাচীন। ১৬৭২ সালে ফ্রান্সের পাদার ডিমিয়া লায়ন্স সর্বপ্রথম শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় নেপোলিয়ন ১৮০৮ সালে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য সুপিরিয়র নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে ১৮২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে, ১৮৩৬ সালে যুক্তরাজ্যে, ১৮৪৬ সালে নেদারল্যান্ডে শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। কালক্রমে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রে শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কার্যক্রমের সূচনা হয় এবং বিভিন্ন পরিসরে বিস্তার লাভ করে।

সাধারণভাবে প্রশিক্ষণ বলতে বুঝায় অংশগ্রহণকারীদের কর্মকেন্দ্রিক জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত সুসংগঠিত কার্যক্রমকে। প্রশিক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য হল-কোন নির্ধারিত বিষয়ের উপর জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন। প্রশিক্ষণ বলতে এমন কিছু কার্যক্রমকে বুঝায় যার মাধ্যমে পূর্ব নির্ধারিত এবং প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা যায়। শাব্দিক অর্থে হাতে কলমে শিক্ষাই হল প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ পেশা উন্নয়নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এজন্য বলা হয় 'Education for the life, training for a particular profession'. অর্থাৎ জীবন গড়ার জন্য শিক্ষা আর বিশেষ কোন পেশার জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ।

সুপরিকল্পিত শিক্ষাক্রম, যোগ্য শিক্ষক এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশে উপর শিক্ষার গুণগতমান নির্ভরশীল। এই উপাদানগুলোর মধ্যে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যোগ্য শিক্ষক হওয়ার জন্য আবশ্যক (১) পাঠদানের বিষয়বস্তু ভালভাবে জানা (২) শিক্ষা বিজ্ঞানের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন; (৩) শিক্ষাদানের মন মানিসকতা নিজের মধ্যে গড়ে তোলা। এই আবশ্যক উপাদানগুলো পূরণ করতে পারলেই শিক্ষক নিজের বিষয়বস্তু পাঠদানে পারদর্শী হয়ে ওঠেন এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টিতে, জ্ঞান লাভে ও দক্ষতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করতে এবং আচরণে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হন। এই গুণাবলি অর্জনের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সর্বজনস্বীকৃত। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালু রয়েছে। যেমন– বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ, চাকরি পুর্বকালীন প্রশিক্ষণ, চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। শিক্ষক প্রশিক্ষণকে এখন 'শিক্ষক শিক্ষা' (Teacher Education) নামেও অভিহিত করা হয়।

ভারত উপমহাদেশে বৈদিক বা আর্যশিক্ষা, বৌদ্ধ শিক্ষা, মুসলিম শিক্ষা নামে বিভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল। উপর্যুক্ত সকল শিক্ষা দেশীয় শিক্ষা নামে পরিচিত ছিল। ব্রিটিশদের দ্বারা এই উপমহাদেশের ক্ষমতা দখলের পরও বহুদিন পর্যন্ত ফার্সি ও সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা নির্ভর দেশীয় শিক্ষা প্রচলিত ছিল। ১৮৩৫ সালে মেকলের মিনিউট এর ফলে উপমহাদেশে পাশ্চাত্য প্রভাবিত শিক্ষা প্রবর্তনের সূচন হয়। সেই সময় থেকেই প্রাথমিক, মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা প্রভৃতি স্তরভিত্তিক শিক্ষার সূচনা ঘটে। ১৮৫৪ সালে উডের ডেপপ্যাচে সর্বপ্রথম শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বিদ্যালয়সমূহের জন্য যোগ্য ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রয়োজন মেটাবার দিকেও ডেসপ্যাচ আলোকপাত করে। সে সময় ইংল্যান্ডে নরমাল ও মডেল স্কুল (Normal and Model School) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করা হত। অনুরূপ নরমাল স্কুল প্রত্যেক প্রদেশে প্রতিষ্ঠার জন্য ডেসপ্যাচের প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়। এ বিষয়ে ডেসপ্যাচে ইংল্যান্ডে প্রচলিত একটি জনপ্রিয় "Practice" ভারত উপমহাদেশে প্রচলন করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই "Practice" হচ্ছে শিক্ষকতা পেশায় উপযুক্ত ব্যক্তিদের নরমাল স্কুলে স্টাইপেন্ডসহ প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা এবং প্রশিক্ষণ শেষে সনদ প্রদান করা এবং চাকরিতে নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

শুরুতে উপমহাদেশে শিক্ষক শিখন বলতে শিক্ষণে পারদর্শিতা অর্জন না বুঝিয়ে সাধারণ বিষয় যেমন– বীজগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতিবিদ্যা ও ইতিহাস জ্ঞান লাভ বুঝাত। ১৮৫৭ সালে ঢাকায় একটি নরমাল স্কুল স্থাপিত হয়। পরবর্তী কালে ১৮৬৯ এ ১৮৮২ সালে যথাক্রমে কুমিল্লা ও রংপুরে আরো দুটি নরমাল স্কুল স্থাপিত হয়। কুমিল্লাস্থ নরমাল স্কুলটি ১৮৮৫ সালে চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হয। ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশনে মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতা করার জন্য গ্রাজুয়েটদের এক বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণের সুপারিশ করে। ১৯০৮ সালে কলকাতায় ডেবিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ এবং ১৯০৯ সালে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ স্থাপিত হয়। মি: ডব্লিউ ই গ্রিফিথ ছিলেন ডেবিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ। অন্যদিকে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন মি: ইভান বিস। অন্যদিকে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, এই দুইটি কলেজই বিংশ শতাব্দীর চল্লিশ দশক পর্যন্ত গোটা বাংলার শিক্ষক শিক্ষণের প্রয়োজন কোন প্রকারে মেটাতে সমর্থ হয়েছিল" (দাশগুপ্ত: ১৯৮৬: ২৭১)। ১৯১৭ সালে স্যাডলার তার কমিশনে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকের পেশাগত শিক্ষা ও শিক্ষা গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এর ফলশ্রুতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গুরুতে প্রতিষ্ঠিত বিভাগগুলোর একটি ছিল দর্শন ও শিক্ষা বিভাগ। অন্যদিকে ১৯৪০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ স্থাপিত হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিভিন্ন ধারা রয়েছে। এগুলো হচ্ছে:

ক. প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ;
খ. মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ;
গ. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষক প্রশিক্ষণ;
ঘ. শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ;
ঙ. উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ;
চ. মাদ্‌রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ;
ছ. বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ।

এই সাতটি ধারায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ওপর ন্যস্ত রয়েছে। নিচে একটি পরিসংখ্যানিক চিত্র তুলে ধরা হলো:

প্রতিষ্ঠান পাবলিক প্রাইভেট মোট

প্রতিষ্ঠান	পাবলিক	প্রাইভেট	মোট
ক. প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (পিটিআই)	৫৩	০১	৫৪
খ. টিচার্স ট্রেনিং কলেজ	১৪	১১৮	১৩২
গ. বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	০১	০০	০১
ঘ. শিক্ষা ও গবেষনা ইন্সটিটিউট (আইইআর)	০৩	০০	০২
ঙ. টেকনিক্যাল শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ	০১	০০	০১
চ. ভোকেশনাল শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ	০১	০০	০১
ছ. শারীরিক শিক্ষা কলেজ	০২	২৫	২৭
জ. উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট	০৫	০০	০৫
ঝ. মাদ্‌রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট	০১	০০	০১
ঞ. বিশেষ শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	০১	০১	০২

শিক্ষক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

- শিক্ষকদের শিখন-শিখানো কলাকৌশল সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।
- শিক্ষকদের পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং সময়ের সঙ্গে যুগোপযোগীকরণে সহায়তা দান।
- শিক্ষকদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব, উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি এবং নেতৃত্বের গুণাবলী জাগ্রত করা।
- শিক্ষণের জন্য আধুনিক উপকরণ ব্যবহার সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন ও ব্যবহারে উৎসাহিত করা।
- নতুন নতুন শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন এবং ব্যবহারে উৎসাহিত করা।
- সমাজের সকল ধর্ম, বর্ণ জাতিসত্ত্বা, আর্থ সামাজিক শ্রেণির শিক্ষার্থীকে সমান সুযোগ দিয়ে পাঠদানে উৎসাহিত করা।
- দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতন থেকে কার্য-সম্পাদনের জন্য শিক্ষকদের উৎসাহিত করা।
- গবেষণা কাজে অংশগ্রহণের জন্য আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি এবং উৎসাহিত করা।

শিক্ষকদের মর্যাদা

সামাজিক বাস্তবতা সামনে রেখে সকল স্তরের ও ধারার শিক্ষকের মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা এবং দায়-দায়িত্বের বিষয় গভীরভাবে বিবেচনা করে তা পুনবিন্যাসের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এ বিষয়টির দুটি বিশেষ দিক রয়েছে:

- **শিক্ষকদের মর্যাদা ও সুবিধা:** শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা শুধুমাত্র সুবিন্নস্ত বাক্য গাথার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্রকৃত অর্থে তাদের সামাজিক মর্যাদা দেওয়া না হলে শিক্ষার মানোনড়বয়ন করা সম্ভব নয়। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষকদের আত্মপ্রত্যয়ী, কর্মদক্ষ ও শিক্ষা ক্ষেত্রে এক একজন সফল অবদানকারী হিসেবে গড়ে তোলা জরুরি। এজন্য শিক্ষকদের দেশ বিদেশে প্রশিক্ষণ দেওয়া, শিক্ষা খাতকে শক্তিশালী করার জন্য প্রাপ্ত বৈদেশিক বৃত্তি ও প্রশিক্ষণের সুযোগ শিক্ষকদের দেওয়া হবে। আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল স্তরের শিক্ষকদের জন্য পৃক বেতন কাঠামো প্রণেয়ন করা হবে।
- প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরের শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দক্ষতা, মর্যাদা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ জরুরি। তাদের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা মূল্যায়ন অব্যাহত থাকবে।

- মহিলা শিক্ষকদের চাকুরিতে নিয়োগসহ কোন ক্ষেত্রেই বৈষম্য রাখা হবে না। সমযোগ্যতা সম্পন্ন মহিলাদের বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
- শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষকদের পদোনড়বতির ক্ষেত্রে জেষ্ঠ্যতা এবং শিক্ষার সকল পর্যায়ে তাদের শিক্ষকতার মান বিবেচনায় আনা হবে। সে জন্য শিক্ষার মান নির্ণয় করার পদ্ধতি নির্ধারণ করা হবে।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে ও সমাজে বিশেষ অবদান, মৌলিক রচনা ও প্রকাশনার জন্য শিক্ষকদের সম্মানিত ও উৎসাহিত করা হবে।
- মেধা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্বাচিত শিক্ষকদের শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে পদায়ন করা হবে এবং তাদের পদোন্নতির সুযোগ থাকবে।
- পেশাগত আচরণ বিধি লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শাস্তিমূলক পদক্ষেপসমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হবে এবং বিধি সম্মতভাবে প্রয়োগ করা হবে।

শিক্ষকের দায়িত্ব

- বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে উন্নত পরিবেশ ও সংহতি সাধন করা;
- শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করা;
- সমাজের সক্রিয় ক্রিয়াশীল সদস্য হওয়ার জন্য পরিপূর্ণ আত্মোপলব্ধিবোধ অর্জনে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা;
- গতিশীল ও সদ্য পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে সামঞ্জস্য বিধানে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা;
- শিক্ষার্থী ও সমাজের নিকট নিজেকে পেশাজীবি শিক্ষকের ভূমিকা আদর্শ (Role Model) হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা;
- শিক্ষার্থীদের দৈহিক সুস্থতার নিশ্চয়তা বিধানে পরামর্শ দান করা;
- পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির যুগোপযোগী করা সহ অব্যাহতভাবে আত্মোনড়বয়ন সাধন করা;
- শিখন পরিবেশ ও সম্পদের ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপনা করা;
- বিদ্যালয় শিক্ষাক্রমের সাথে সমাজের চাহিদার সম্পর্ক স্থাপনে দক্ষ হওয়া;
- বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি নির্বাচন ও ব্যবহারে দক্ষ হওয়া;
- মূল্যায়ন পদ্ধতির কলাকৌশল অনুশীলন ও দক্ষ হওয়া;
- বিভিন্ন গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ দক্ষ হওয়া এবং
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক নির্দেশনা ও যাবতীয় কার্যাদির সুচারুরূপে সম্পন্ন করা।

উপসংহার

উন্নত শিক্ষার জন্য প্রয়োজন উন্নত শিক্ষক। উন্নত শিক্ষক পাওয়ার জন্য প্রয়োজন উচ্চ মানসম্পন্ন চাকুরি-পূর্ব শিক্ষক শিক্ষা কার্যক্রম। এ ছাড়াও নিযুক্তি লাভের পর শিক্ষকদের পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও সচেতনতা অব্যাহত বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নিচের কোনটি শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে?
ক. আর্থ ও সামাজিক অবস্থা
খ. দারিদ্রতা
গ. প্রশিক্ষণের অপর্যাপ্ততা
ঘ. দুর্বল শিক্ষা ব্যবস্থা

২. নিচের কোনটির মাধ্যমে শিক্ষকদের মর্যাদা দেওয়া সম্ভব?
ক. আর্থিক মর্যাদা বৃদ্ধি
খ. পদ মর্যাদা বৃদ্ধি
গ. সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি
ঘ. সবগুলোই সঠিক

৩. কত সালে নেপোলিয়ন শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য সুপিরিয়র নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন?
ক. ১৮০৮ খ্রী
খ. ১৮২৩ খ্রী
গ. ১৮৩৬ খ্রী
ঘ. ১৮৪৬ খ্রী

উত্তরমালা: ১। গ, ২। ঘ, ৩। ক

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষক প্রশিক্ষণ বলতে কী বুঝায়?
২. বাংলাদেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণের কয়টি ধারা ও কি কি?
৩. শিক্ষক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ লিখুন।

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষক প্রশিক্ষণের পটভূমি ব্যাখ্যা করুন।
২. পেশাগত দক্ষতা ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে একজন শিক্ষকের ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।
৩. একজন শিক্ষকের মর্যাদা লাভে কি কি করণীয় বলে আপনি মনে করেন?

পাঠ- ৫.৩: একীভূত শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- একীভূত শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- একীভূত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- একীভূত শিক্ষার সুফল ও একীভূত শিক্ষার চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

একীভূত শিক্ষা

একীভূত কথাটার অর্থ হলো সমাজের সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ। একীভূত শিক্ষা হলো সকল শিক্ষার্থীকে মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় এনে একসাথে শিক্ষা দেয়া। একীভূত শিক্ষা হলো সকল শিক্ষার্থীর জন্য একই পদ্ধতির সর্বজনীন ও বৈষম্যহীন শিক্ষা সংস্কার ব্যবস্থা যাতে শিক্ষার্থীর চাহিদা, সামর্থ্য, সাতন্ত্র্য, প্রত্যাশা এবং সম্ভাবনার মাধ্যমে শিখন ও জ্ঞানের পাশাপাশি সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নীত করে। এটি একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বৈচিত্রময় চাহিদা পুরণ করা যায়।

UNESCO প্রদত্ত সংজ্ঞা- Inclusive education is a process, which involves changes and modification in contents, approaches, structure and strategies with a common vision which covers all children of appropriate age and a conviction that it is the responsibility of the regular system to educate all.

একীভূত বিদ্যালয়

সকল শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আবেগ-অনুভূতি, বিশ্বাস, ধর্ম, ভাষা বা অন্য কোন বিভিন্নতা থাকা সত্বেও একই বিদ্যালয়ে আসতে বাধা দেয়া যাবে না। একই বিদ্যালয়ে যাতে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, শ্রমজীবি শিশু, পথ শিশু, যাযাবর সম্প্রদায়ের শিশু, উপজাতীয় বা ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার শিশু এবং সুবিধা বঞ্চিত বিভিন্ন পরিবারের শিশুরা যাতে শিক্ষা অর্জন করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

❖ একীভূত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

- প্রত্যেক শিশুর শিক্ষার অধিকার রয়েছে এবং তাদের মূলধারার শিক্ষায় সমানভাবে অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে;
- শিক্ষা থেকে বাদ পড়তে পারে এমন বাধাসমূহ চিহ্নিত ও অপসারণ করা;
- শুধু স্কুলে ভর্তি করা নয় বরং সকল শিশুর পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ ও শিক্ষা অর্জন নিশ্চিত করা;
- শিশুদের বিভিন্নতা, বৈচিত্রতা ও পার্থক্যগুলোর প্রতি ইতিবাচক সাড়া প্রদান করা;
- শিখন-শেখানো কার্যক্রমের গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে সকল শিশুর শিক্ষার চাহিদা পূরণ করা।

❖ একীভূত শিক্ষার সুফল

শিক্ষার্থীর সুফল

- সকল শিক্ষার্থী মুক্তভাবে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে;

- সকল শিক্ষার্থী আত্মবিশ্বাস ও স্বকীয়তা অর্জন করে;
- প্রত্যেকেরই ভিন্নতা ও ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা রয়েছে- সব শিশু তা বুঝতে পারে;
- সকল শিক্ষার্থীই মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণ করে;
- প্রত্যেক শিক্ষার্থী একে অপরের সহায়তাকারী হিসেবে বেড়ে উঠে।

শিক্ষকের সুফল

- শিখন-শেখানো কার্যক্রম শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক, কার্যকর ও সৃজনশীল হয়;
- সমাজ ও অন্যান্য ব্যবস্থা থেকে শিক্ষক বেশি সহযোগিতা পেয়ে থাকেন;
- শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষক সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়।

অভিভাবকের সুফল

- শিশুর শিখনের সঙ্গে অভিভাবক আরো বেশি সম্পৃক্ত হন;
- বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন কৌশল শেখার মাধ্যমে অভিভাবকের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে;
- বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে অভিভাবকদের বেশি সম্পৃক্ততার কারণে শিশুর শিক্ষা ও সমস্যা সম্পর্কে বেশি সচেতন হন।

❖ একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা

- একীভূত শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের স্বল্পতা;
- একীভূত শিক্ষা বিষয়ে উপযোগী কারিকুলাম ও শিক্ষা উপকরণের স্বল্পতা;
- অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত বিদ্যালয়;
- সকল শিশুর (বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ) শিক্ষার অধিকার রয়েছে বিষয়টি সম্পর্কে সচেতনতার অভাব;
- সমাজের সকল স্তরের জনগোষ্ঠীর শিশুর বিশেষ করে সুবিধা বঞ্চিত ও প্রান্তিক শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে সচেতনতার অভাব।

❖ একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ

- একীভূত শিক্ষা বিষয়ে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন;
- নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও বোধগম্যতা তৈরি;
- শিক্ষক ও মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের পর্যাপ্ত সহায়তা প্রদান;
- বর্তমান কাঠামোর মাঝে থেকে সঠিক এবং উপযোগী শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- উপযোগী শিখন-শেখানো উপকরণ ও শিখনসামগ্রী সরবরাহ এবং তার ব্যবহার;
- সকল শিশুর শিখনের প্রতি লক্ষ্য রেখে নমনীয় কারিকুলাম, সময়সূচি এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রণয়ন;
- প্রত্যেক শিশুর শিখন চাহিদার উপর ভিত্তি করে তার উপযোগী শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ

একীভূত শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছিল প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার অধিকার আইনের আদায়ের সংগ্রাম থেকে। পরববর্তীতে **১৯৮১** সালকে জাতিসংঘ বিশ্ব প্রতিবন্ধী বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করায় আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে বেশ কিছু আইন ও নীতিমালা গ্রহণ করা হয় এবং অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নিচের কারা একীভূত শিক্ষার সুফল ভোগ করে?
   ক. সকল শিক্ষার্থী
   খ. মানসিক প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থী
   গ. বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী
   ঘ. শারীরিক প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থী

২. নিচের কোনটি একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ?
   ক. উপযুক্ত শিক্ষাপোকরণের অভাব
   খ. উপযুক্ত বই এর স্বল্পতা
   গ. সেকেলে দৃষ্টিভঙ্গি
   ঘ. বিদ্যালয়ে আর্থিক সমস্যা

উত্তরমালা: ১. ক, ২. গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. একীভূত শিক্ষা কী?
২. একীভূত শিক্ষার বৈশিষ্টসমূহ লিখুন।
৩. একীভূত শিক্ষার সুফলগুলো উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে একজন শিক্ষকের ভূমিকা লিখুন।
২. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতাগুলো উল্লেখপূর্বক একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে গৃহীত চ্যালেঞ্জসমূহ উল্লেখ করুন।

পাঠ- ৫.৪: বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু
Education of Exceptional Children

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু একটি ব্যাপক অর্থ নির্দেশক শব্দ। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর গড় মান সাধারন মানুষের থেকে বেশী হয় আবার কমও হয়। অর্থাৎ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু বলতে বুদ্ধির দিক থেকে মেধাবী এবং গুরুতরভাবে প্রতিবন্ধী শিশু উভয়কে বুঝায়। এই দুই ধরনের শিশুর ক্ষেত্রে বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারণ এরা অসীম, সম্ভাবনাময় এবং এদের শিক্ষা চাহিদা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর সংজ্ঞা

যে সকল শিশুর ইন্দ্রিয় ক্ষমতা বুদ্ধি বা শারীরিক ক্ষমতা এতটাই ভিন্ন যে কারণে তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহনের প্রয়োজন হয়। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু বলতে সেই সব শিশুদের বুঝায় যারা সমবয়স্কদের তুলনায় বুদ্ধি, সংবেদন, শারীরিক বৈশিষ্ট্য, ভাব বিনিময় ক্ষমতা ও সামাজিক দক্ষতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মাত্রার কম বা বেশী হয় তাকেই ব্যতিক্রমী শিশু বলে আখ্যায়িত করা হয়। অর্থাৎ যারা সাধারণের বাইরে তারাই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু। বুদ্ধাংকের দিক থেকে বলা যায় যাদের বুদ্ধাংক ৭৫ এর নিচে এবং ১২০ এর উপরে তারাই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর প্রকারভেদ

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. প্রতিভাবান শিশু (Meritorious)
২. প্রতিবন্ধী শিশু (Autistic)

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর লক্ষণসমূহ

- **বুদ্ধি:** সাধারণ শিশুদের তুলনায় বুদ্ধিমত্তা গড় মানের চেয়ে কম বা বেশি হয়।
- **সংবেদন:** সংবেদন ক্ষমতার পার্থক্য হয়, এর মধ্যে যেমন চোখ ও কান প্রধান আবার তেমন শোনার ও দেখার পার্থক্য হয়।
- **ভাববিনিময়:** ভাব বিনিময় করার ক্ষেত্রে পার্থক্য হয়।
- **আচরনগত পার্থক্য:** আচরনের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী শিশুর মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।
- **শারীরিক ক্ষমতা:** শারীরিক নড়াচড়া অর্থাৎ অঙ্গ সঞ্চালন দক্ষতার অক্ষমতা।
- **সামাজিক দক্ষতা:** সামাজিক দক্ষতার ক্ষেত্রে অক্ষম হয় বা পার্থক্য দেখা যায়।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর বৈশিষ্ট্য

- অনগ্রসর শিশু প্রধানত কম মেধা সম্পন্ন হয়।
- শ্রেণিতে চুপচাপ থাকে এবং সাধারণ সংশোধনের ব্যাপারেও ধীরগতি প্রদর্শন করে।
- মানসিক ভাবে অনগ্রসরদের অভিযোজন ক্ষমতা কম হয়।
- নিজেদের আবেগ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কোন সক্রিয়তা থাকে না।
- সাধারনভাবে কোন পাঠ শিখতে যতটুকু সময় লাগার কথা তার চেয়ে বেশী সময় ব্যয় করে।
- একটু বড় হবার সাথে সাথে অপরের তুলনায় তাদের গ্রহণ ক্ষমতা, কর্মক্ষমতা, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা কম হতে দেখা যায়।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর জন্য শিক্ষকের দায়িত্ব

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর প্রতি শিক্ষক বিশেষ যত্ন নিবেন।এক্ষেত্রে শিক্ষক যাযা করতে পারেন–

- শিশু কিপারে আর কি পারে না তা খুজে বের করার চেষ্টা করবেন।
- শিক্ষোপকরণ দিয়ে শ্রেণি কক্ষে পাঠদান করবেন।
- শ্রেণির অন্য শিশুরা তাকে যেন উপহাস না করে, সহযোগিতা করে সে বিষয়ে খেয়াল রাখবেন।
- শিশুর ধারণ ক্ষমতাও রুচি অনুযায়ী পাঠদান করবেন।
- শ্রেণিকক্ষটি যেন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর শিখন পরিবেশ বজায় থাকে সেদিকে খেয়াল রাখবেন।
- অভিভাবকের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন।
- শিক্ষক হবেন আন্তরিক-যত্নশীল এবং বন্ধুশুলও।
- প্রতি শিশুকে পর্যবেক্ষণ করা এবং শিখন সমস্যা সনাক্ত করা।
- শিক্ষার্থীদের সাথে সহযোগিতামূলক আচরণ করা।
- শিখনে উৎসাহ সৃষ্টি করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নিচের কোনটি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু?
   ক. সাধারণ মানের শিশু
   খ. অতি মেধা সম্পন্ন শিশু
   গ. যার বুদ্ধাঙ্ক প্রায় ১০০
   ঘ. যে শিশু স্বাভাবিক কাজ করতে পারে

২. বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের মানসিক বিকাশে বিদ্যালয়ে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারেন কে?
   ক. প্রধান শিক্ষক
   খ. শ্রেণি শিক্ষক
   গ. কর্মচারী
   ঘ. সভাপতি

উত্তরমালা: ১. খ, ২. খ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু বলতে কী বোঝায়।
২. বিশেষ চাহিদা শিশু কত প্রকার।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের মানসিক বিকাশে বিদ্যালয়ের শিক্ষকের ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।
২. বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর লক্ষণগুলো লিখুন।
৩. বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।

পাঠ- ৫.৫: কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা
Technical and Vocational Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কারিগরি শিক্ষার কোর্সসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।

কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা (TVC)

যে শিক্ষা শিক্ষার্থী তার বাস্তব জীবনে ব্যবহার করে কোন একটি নির্দিষ্ট পেশায় নিযুক্ত হতে পারে তাই "কারিগরি শিক্ষা"। কারিগরি শিক্ষা গ্রহণের পর শিক্ষার্থীকে পেশা নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। সে নিজেই অর্জিত শিক্ষার সাথে মিল রেখে স্বাধীনভাবে পেশা খুঁজে নিতে পারে।

এ শিক্ষার প্রধান সাফল্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ। এর উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিকে পরবর্তী জীবনে নির্দিষ্ট কোন কারিগরি বিষয়ে দক্ষ করে তোলা। নিজ নিজ উদ্যোগে স্থানীয় ছোট ছোট শিল্পের প্রসার ঘটানো। এছাড়াও স্বাধীনভাবে পছন্দ অনুযায়ী বৃত্তি নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদকে কাজে লাগিয়ে দক্ষকর্মী হতে সহায়তা করা।

বাংলাদেশে কারিগরী শিক্ষার প্রসারে ১৯৬০ সালে কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর গঠন করা হয়। কারিগরী শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার জন্য ১৯৬৭ সালে কারিগরী শিক্ষা বোর্ড গঠন করা হয়। বাংলাদেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মান প্রণয়ন, নিয়ন্ত্রণ, মূল্যায়ন ও উন্নয়নের সার্বিক দায়িত্ব বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের উপর ন্যস্ত।

কারিগরি শিক্ষার কোর্সসমূহ

১. এসএসসি (ভোকেশনাল) ২ বছর মেয়াদী;
২. এইচএসসি (ভোকেশনাল) ২ বছর মেয়াদী;
৩. এইচএসসি (বিজনেস ম্যানেজম্যান্ট) ২ বছর মেয়াদী;
৪. ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং (৪ বছর মেয়াদী);
৫. ডিপ্লোমা-ইন-এগ্রিকালচার (৪ বছর মেয়াদী);
৬. ডিপ্লোমা-ইন-ফিশারিজ (৪ বছর মেয়াদী);
৭. পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট।

বোর্ডের অধীনে পরিচালিত শিক্ষাক্রম

- ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিইয়ারিং;
- ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং;
- ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার;
- ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি;

- ডিপ্লোমা ইন মেরিন টেকনোলজি;
- ডিপ্লোমা ইন হেলথ টেকনোলজি;
- এইএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা);
- এইচএসসি (ভোকেশনাল) ও
- এসএসসি (ভোকেশনাল)।

বোর্ড এর অধীনে চার (৪) বছর মেয়াদী শিক্ষাক্রম পরিচালিত হয়। চার বছর মেয়াদী শিক্ষাক্রম আটটি (৮) পর্বে বিভক্ত, যাদের সিমেস্টার বলা হয়। এক একটি সেমিস্টারের কার্য-দিবস ১৬ সপ্তাহ থেকে ১৮ সপ্তাহ ১৬-১৮ সপ্তাহ। সে হিসেবে প্রতি বর্ষের কার্য-দিবস ৩২-৩৬ সপ্তাহ। নির্ধারিত কার্য-দিবস শেষ হওয়ার পর পর্ব-সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

ভোকেশনাল শিক্ষা

পেশাগত অর্থে, ভোকেশনাল শিক্ষা ব্যবস্থা (ভেট) হল কাউকে চাকুরী বা কর্মের জন্য উপযুক্ত করে তৈরি করা। সামষ্টিক অর্থে ভেট ট্রেনিং ব্যবস্থা নির্ভর করে কোন দেশের আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশের উপর। এ অর্থে পৃথিবীর যে কোন দেশের চেয়ে আমাদের দেশের ভেট ব্যবস্থা হবে আরো বেশী বিস্তৃত। বিদেশে ভেটে শিক্ষা দেয় ব্যবসায়ে, প্রশাসনে, বিজ্ঞানে, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ, হেলথ সাইন্স ইত্যাদিতে। তাই মাঝে মাঝে ভেটকে বলা হয় স্বীকৃত টেকনিক্যাল এডুকেশন ব্যবস্থা যার কদর অনেক সময় বিশ্ববিদ্যালয়কেও ছাড়িয়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৫

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোন শিক্ষা গ্রহণের পর শিক্ষার্থীকে পেশা নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না?
   ক. ভোকেশনাল
   খ. কারিগরি
   গ. কারিগরি ও ভোকেশনাল
   ঘ. সাধারণ শিক্ষা

২. নিচের কোনটি কারিগরি শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত নয়?
   ক. ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
   খ. ডিপ্লোমা-ইন-ফিশারিজ
   গ. এসএসসি (ব্যবসায় শিক্ষা)
   ঘ. এইএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা)

উত্তরমালা: ১. খ, ২. গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. কারিগরি শিক্ষার কোর্স কী কী?
২. ভোকেশনাল শিক্ষা বলতে কী বোঝায়।

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. দেশব্যাপী শিক্ষায় আইসিটি সম্প্রসারণে কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষার ভূমিকা লিখুন।
২. বাস্তব জীবনে কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব উল্লেখ করুন।

পাঠ- ৫.৬ঃ আদিবাসী শিক্ষা
Indigenous Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আদিবাসীদের চিহ্নিতকরতে পারবেন।
- আদিবাসীদেরসম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

আদিবাসী

আদিবাসী সম্প্রদায় হতে হলে তাকে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে হবে।

বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

- **নিজস্ব ভাষাঃ** আদিবাসী সম্প্রদায় হতে হলে তার একটি নিজস্ব ভাষা থাকতে হবে। যেমন- শাওতালী ভাষা, নাগরি ভাষা, সাদ্রি ভাষা, কুড়ুক ভাষা ইত্যাদি।
- কৃষ্টিকালচার: আদিবাসী সম্প্রদায় জন্ম ও মৃত্যুতে ঢাক ঢোলক বাজিয়ে আনন্দ এবং শোক প্রকাশ করে থাকে। এই আনন্দ ও শোক প্রকাশ এক এক সম্প্রদায়ের মধ্যে এক এক রকম পরিলক্ষিত হয়।
- **প্রথাঃ** তাদের নিজস্ব প্রথা আছে। যেমন- বিবাহের অনুষ্ঠানে কোন ব্রাহ্মন লাগে না। অনুষ্ঠানে উভয় বর ও কনের পূর্ব পুরুষদের ৭ সিঁড়ির নাম উচ্চারণ করতে দেখাযায়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নিজ সম্প্রদায়ের পুরোহিতকে ধর্মীয় কাজে আনতে দেখা যায়।
- **রীতিনীতিঃ** আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজস্ব রীতি-নীতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন- কিছু কিছু অনগ্রসর সমপ্রদায়কে আজও তীর-ধনুক চালানোর রীতিনীতি মতে পশু-পাখি শিকার করতে দেখা যায়।
- **নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসঃ** আদিবাসী সম্প্রদায়কে নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করতে দেখা যায়। যেমন- জঙ্গলের মধ্যে, পাহাড়-পর্বত এলাকায়, সমতল এলাকায়, কোন পুকুর পাড়ে বা নদীর ধারে। তাদের ধারণা জঙ্গলেই মঙ্গল।
- **নিজেকে আদিবাসী হিসেবে দাবি করাঃ** যারা নিজেদের আদিবাসী বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো যাদের মধ্যে বিদ্যমান, তাদেরকেই আমরা আদিবাসী বলি। ১৯৮৯ সালের গৃহিত আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (ILO)-এর ১৬৯ নং কনভেনশনের ১ নং আর্টিকেলে আদিবাসীদের সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। 'Tribal people in independent countries (are those) whose social, cultural and economic conditions distinguish them from other sections of national community and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations.'

অর্থাৎ, কোন স্বাধীন দেশে বসবাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠী হচ্ছে তারাই যাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ঐ দেশে বসবাসকারী মূল জাতিগোষ্ঠী থেকে আলাদা এবং যারা আংশিক বা সম্পূর্ণরুপে তাদের নিজস্ব প্রথা, ঐতিহ্য অথবা বিশেষ কোন আইন বা রীতিনীতি দ্বারা পরিচালিত হয়।

- ক্ষুদ্র আদিবাসীর নাম-
- ক্ষুদ্র আদিবাসীর আঞ্চলিক অবস্থান

আদিবাসী শিক্ষা

২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষা নীতিতে প্রাথমিক স্তরে আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্রজাতি সত্তার জন্য স্ব স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। এই শিক্ষা নীতির প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা অধ্যায়ে 'আদিবাসীশিশু'দের শিক্ষার ব্যাপারে ৩টি অনুচ্ছেদ বরাদ্দ করা হয়েছে। এগুলো হলো:

- ১৮ আদিবাসী শিশুরা যাতে নিজেদের ভাষা শিখতে পারে সেই লক্ষ্যে তাদের জন্য আদিবাসী শিক্ষক ও পাঠ্য পুস্তকের ব্যবস্থা করা হবে। এই কাজে, বিশেষ করে পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নে, আদিবাসী সমাজকে সম্পৃক্ত করা হবে।
- ১৯ আদিবাসী প্রান্তিক শিশুদের জন্য বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে।
- ২০ আদিবাসী অধ্যুষিত (পাহাড় কিংবা সমতল) যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সে সকল এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। যেহেতু কোনো কোনো এলাকায় আদিবাসীদের বসতি হালকা তাই একটি বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের আবাসিক ব্যবস্থার প্রয়োজন হলে সেদিকেও নজর দেয়া হবে।

বাংলাদেশে আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষার উদ্যোগ সরকারিভাবে নেওয়া হয়েছ। সেই উদ্যোগের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে পাঁচটি ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক স্তরের জন্য বই ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মতো সরকারিভাবে বর্তমানে পাঁচটি আদিবাসী ভাষায় 'মাতৃভাষায় শিক্ষা' কার্যক্রম চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ভাষাগুলো হলো-

- চাকমা
- মারমা
- ত্রিপুরা
- গারো ও
- সাদ্রি।

পাঁচটি ভাষার মধ্যে সাদ্রি লেখা হচ্ছে বাংলা হরফে, ত্রিপুরা ও গারো রোমান ('ইংরেজি') হরফে, এবং চাকমা ও মারমা 'নিজস্ব' হরফে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৬

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সরকারিভাবে বর্তমানে কয়টি আদিবাসী ভাষায় 'মাতৃভাষায় শিক্ষা' কার্যক্রম চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে?
ক. চারটি
খ. পাঁচটি
গ. ছয়টি
ঘ. সাতটি

২. নিচের কোনটি আদিবাসীদের বৈশিষ্ট্য নয়?
ক. জন্ম ও মৃত্যুতে ঢাক ঢোলক বাজিয়ে আনন্দ এবং শোক প্রকাশ করে
খ. নিজস্ব রীতি-নীতি পরিলক্ষিত হয়
গ. একটি নির্দিষ্ট ধর্মে বিশ্বাসী
ঘ. নিজেদের আদিবাসী বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে

উত্তরমালা: ১. খ, ২. গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. আদিবাসী বলতে কী বোঝায়?
২. আদিবাসীর বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আদিবাসীদের শিক্ষা বাস্তবায়নে সরকারের চ্যালেঞ্জসমূহ বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ- ৫.৭: সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা
Private and Public Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার স্তর চিহ্নিত করতে পারবেন।
- শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্ক বলতে পারবেন।

বাংলাদেশের শিক্ষা স্তর

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সদা পরিবর্তনশীল এবং বিভিন্নরূপ শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয়ে গঠিত। এই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রধানত তিন স্তর বিশিষ্ট।

- প্রাথমিক স্তর
- মাধ্যমিক স্তর এবং
- উচ্চশিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তর

জাতীয় শিক্ষানীতি– ২০১০

শিশুর অন্তর্নিহিত অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতুহল আনন্দবোধ ও অফুরন্ত উদ্যমের মতো সর্বজনীন মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ এবং প্রয়োজনীয় মানসিক ও দৈহিক প্রস্তুতি গ্রহণের পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন। সে জন্য শিশুদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করার আগে তাদের জন্য বিদ্যালয় প্রস্তুতিমূলক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা জরুরি। কাজেই ৫^{+} বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য প্রাথমিকভাবে এক বছর মেয়াদি প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হবে। পরবর্তীকালে তা ৪^{+} বছর শিশু পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে। এই পর্যায়ে শিক্ষাক্রম মূলভিত্তি হবে শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুর আগ্রহ সৃষ্টিমূলক এবং সুকুমার বৃত্তির অনুশীলন এবং অন্যদের প্রতি সহনশীলতা এবং পরবর্তী আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ।

প্রাথমিক শিক্ষা

বাংলাদেশে বর্তমানে ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্য ৫ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত রয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ১১ প্রকার প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। সেগুলো হলো–

১. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়;
২. রেজিস্টার্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়;
৩. কমিউনিটি বিদ্যালয়;
৪. আন-রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়;
৫. উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়;
৬. এবতেদায়ি মাদ্‌রাসা;
৭. উচ্চ মাদ্‌রাসা সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়;
৮. পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষা বিদ্যালয়

৯. স্যাটেলাইট বিদ্যালয়;
১০. কিন্ডারগার্টেন স্কুল;
১১. এনজিও পরিচালিত পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয়।

এসব বিদ্যালয়ে প্রায় এক কোটি আশি লক্ষ শিশু লেখাপড়া করে। শিক্ষক সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ।

মাধ্যমিক শিক্ষা

বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে বোঝায় প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার মধ্যবর্তী পর্যায়। অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তী ও ডিগ্রি শিক্ষার পূর্ববর্তী শিক্ষাক্রম মাধ্যমিক শিক্ষা নামেই চিহ্নিত। মাধ্যমিক শিক্ষা শিক্ষা কাঠামোর দ্বিতীয় স্তর। শিক্ষার্থীদের বয়ঃসীমা অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা কৈশোর ও কৈশোরোত্তর কালের শিক্ষা। বর্তমানে বাংলাদেশে সাত বছর মেয়াদি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রচলিত রয়েছে। এ শিক্ষা তিনটি স্তরে বিভক্ত। নিচে তিনটি স্তরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো–

ক. **নিম্ন মাধ্যমিক স্তরঃ** নিম্ন মাধ্যমিক স্তরটি ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত তিন বছর মেয়াদী। এটি মাধ্যমিক শিক্ষার প্রারম্ভিক স্তর। এসব বিদ্যালয় বেসরকারিভাবে পরিচালিত হয়। বর্তমানে এসব বিদ্যালয়ে ৩,৬৭,৫১০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করে। বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৪১২টি প্রায়।
খ. **মাধ্যমিক স্তরঃ** মাধ্যমিক স্তরটি নবম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত দুই বছর মেয়াদী। এ স্তরে বর্তমানে বহুমুখী (মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা) শিক্ষাক্রম চালু রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে।
গ. **উচ্চ মাধ্যমিক স্তরঃ** উচ্চ মাধ্যমিক স্তর একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত দুই বছর মেয়াদী। এ স্তরে বহুমুখী শিক্ষাদান চালু রয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাদানের জন্য ১১টি সরকারি ও ৯৫৩টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্টান রয়েছে। এছাড়াও ৮৬৮টি সরকারি ও বেসরকারি ডিগ্রি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে লেখাপড়া সুযোগ রয়েছে।

উচ্চ শিক্ষা (বিশ্ববিদ্যালয় স্তর)

উচ্চ শিক্ষা বলতে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার পরবর্তী পর্যায়ের সকল শিক্ষাকে বোঝানো হয়। উচ্চ শিক্ষা উচ্চতর মানবসম্পদ সৃষ্টি করে রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার কতকগুলো ধারা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সাধারণ শিক্ষা, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অধ্যায়নের সুযোগ রয়েছে। সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে স্নাতক (সম্মান ও পাস) ৪ বছর মেয়াদী, স্নাতকোত্তর ১ বা ২ বছর মেয়াদী কার্যক্রম চালু রয়েছে। এছাড়া এম.ফিল, পিএইচ.ডি প্রভৃতি শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে।

অন্যান্য ক্ষেত্রে স্নাতক, স্নাতকোত্তর পিএইচ.ডিসহ উচ্চতর শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। বাংলাদেশে মূলত দুই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসব কার্যক্রমভিত্তিক উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হয়। এগুলো হচ্ছে: (ক) বিশ্ববিদ্যালয় এবং (খ) প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। আবার কলেজগুলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রি প্রদান করে থাকে। এসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো:

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

২০১৫ সালের হিসাব মতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৫টি এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ডিগ্রি, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষা, কৃষি চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ের অধ্যায়নের সুযোগ রয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

এসিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যারয় হিসেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার সিংহভাগ ভূমিকা পালন করে থাকে। সরকারি ও বেসরকারি কলেজসহ প্রায় ২৩৫০টি অঙ্গিভূক্ত ও অধিভূক্ত কলেজ রয়েছে। এসব কলেজ থেকে স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিতে অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে দূরশিক্ষণ এবং টিউটোরিয়াল পদ্ধতিতে এসএসসি, এইচএসসি, স্নাতক, সিএড, বিএড, এমএড, এমবিএ, কৃষি ডিপ্লোমা, নার্সিং ডিপ্লোমা, বেল্ট ইত্যাদি পেশাগত সার্টিফিকেট ও ডিগ্রি প্রদান করে থাকে।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়

বেসরকারি ব্যবস্থাপনা এবং সরকারের অনুমোদনক্রমে ও তত্ত্বাবধানে ২০১৫ সাল পর্যন্ত দেশে ৮৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠেছে। আরও অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি, চিকিৎসা আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিসহ নানান বিষয়ে অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে।

দেশে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা-

- ৬৩,৬০১ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
- ১,০১৬টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
- ২৫,২৪০ টি নতুন জাতীয়রণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
- ৫৩ টি সরকারি ও ২টি বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
- ৫৫ টি পরীক্ষণ বিদ্যালয়
- ২৭৪ টি সরকারি মহাবিদ্যালয় (ডিগ্রি কলেজ ৮৯টি, অনার্স কলেজ ১০০টি, অনার্স ও মাস্টার্স কলেজ ৯০টি এবং ৩৩ টি উচ্চ মাধ্যমিক মহাবিদ্যালয়)
- ১৬টি সরকারি কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট
- ১৪টি সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়
- ৪টি সরকারি আলিয়া মাদরাসা
- ৫টি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়
- ১টি বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
- ৩৩৫টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়
- ২,৩৬৩টি বেসরকারি মহাবিদ্যালয়
- ১৬,১০৯টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়
- ৩টি সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা
- ৭,৫৯৮টি বেসকারি মাদরাসা।

শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা বা ইংরেজির মধ্যে যে কোনটিকে বেছে নিতে পারে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলেজ হিসেবে পরিচিত। এছাড়া রয়েছে মাদ্রাসা ও ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল। এগুলো যথাক্রমে মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড এবং বিদেশী শিক্ষা বোর্ডের তালিকাভুক্ত। মাধ্যমিক পরবর্তী পর্যায়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ স্কুল পরিচালনার জন্য কারিগরি শিক্ষা বোর্ড গঠন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রমও পাঠ্যবই উন্নয়ন, অনুমোদন এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে

নিয়োজিত কর্তৃপক্ষ। বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশনাল ইনফরমেশন অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্স (BANBEIS) গঠন করেছে, যা সকল পর্যায়ের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট তথ্য সংরক্ষণ করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৭

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কয় স্তর বিশিষ্ট?
ক. তিন
খ. চার
গ.পাঁচ
ঘ. ছয়

২. কোন প্রতিষ্ঠানটি সকল পর্যায়ের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট তথ্য সংরক্ষণ করে থাকে।
ক. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
খ. পাবলিক সার্ভিস কমিশন
গ. বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশনাল ইনফরমেশন অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্স
ঘ. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

উত্তরমালা: ১. ক, ২. গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষার স্তর কয়টি ও কী কী?
২. প্রাথমিক শিক্ষার প্রকার ভেদ উল্লেখ করুন।
৩. মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে কী বুঝায়।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. দেশের উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা মূল্যায়ন কর।
২. উচ্চ শিক্ষার বিবরণ দিন।